সংবাদ

018

তারিখ ... 28/3/83 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... 1 ...

সংবাদ

ঢাকা : সোমবার ১৩ই চৈত্র, ১৩৮৯

গণশিক্ষা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা

গণশিক্ষা সম্পর্কে সরকার নাকি নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা করছেন। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক রিপোর্টে তেমন ইঙ্গিতই আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে-এধরনের একটা বক্তব্য শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া গেছে বলেও রিপোর্টে উল্লেখ আছে। এই চিন্তা-ভাবনায় শেষ পর্যন্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে কি বীজ বোনা হবে এবং তাতে কেমন ফসল ফলবে তা বলার সময় এখনো আসেনি। এখন বলতে হয় অতীতের কথা, যখনকার ভ্রান্তি-বিলাসে সময়ের অপচয়, টাকার শ্রাদ্ধ আর কিছু লোকের আখের গোছানোর পথ পরিষ্কার হয়েছে। এর পুরো মাশুল দিতে হচ্ছে দেশবাসীকে। এই ভুলের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্য আগেকার ব্যর্থতার ছবির দিকে একটু ভাল করে তাকানো এবং দেশের বাস্তব অবস্থা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে দেখার দরকার আছে।

শিক্ষার আলোতে দেশকে আলোকিত করতে হলে, জনগণের মধ্যে শিক্ষিতের হার বাড়াতে হলে প্রথম বুঝবার চেষ্টা করতে হবে এপথে বাধা কোথায় এবং কতখানি। স্বাধীনতার আগে এবং পরে প্রত্যেক সরকারই জোর গলায় প্রচার করেছেন শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারে তাঁদের নিজেদের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার কথা। শিক্ষার উন্নয়নে 'আগের চেয়ে বেশী' বেশী বরাদ্দের কথাও প্রতিবছর বাজেটের সময় দেশবাসী শুনে আসছে বহুকাল যাবৎ। এর মধ্যে বিপ্লবের ধুয়া তুলে এক তাক লাগানো কাণ্ড তিন বছর আগে শুরু করা হয়েছিল। নব্বুই কোটি টাকা ব্যয়সম্বলিত সেই বিশেষ কর্মসূচী এক হুজুগ তুলে কিছু লোকের পকেট ভারী করার পর থেমে গেছে। কেন এমন হলো? পর্বত সবসময়ে কেবল মূষিক প্রসব করে কেন? দেশের তিন-চতুর্থাংশ অধিবাসীর এখনো নিরক্ষর থাকার পিছনে নিশ্চয়ই কিছু কারণ আছে। সেই কারণগুলো কি, তা খতিয়ে যদি দেখা হয় তবেই গলদ বুঝা যাবে এবং তা দূর করার পথ মিলবে।

এদেশের সোয়া সাত কোটি মানুষ যারা এখনো অক্ষরজ্ঞানহীন তাদের ঘরের খবর নিলেই জানা যাবে কারণটা মূলতঃ অর্থনৈতিক। দেশের জনসংখ্যার চার-পঞ্চমাংশেরও বেশী লোক চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য এদের উদয়াস্ত কেন, দিবারাত্র পরিশ্রম করতে হয়। এসব বিত্তহীন ও তাদের ছেলেমেয়ের লেখাপড়া করার সময় ও সঙ্গতি কোথায়? গ্রাসাচ্ছাদনের পথ যাদের সংকীর্ণ, তাদের কাছে লেখাপড়ার চাইতে পেটের চিন্তাই তো প্রবল। বর্ণ পরিচয়ের পাঠ নিতে যে সময় খরচ করতে হয়, সেই সময়টুকু সংসারের জন্য না খাটলে তাদের চলে না। সে পাঠ নিতে পয়সা না লাগলেও ওতে তারা বিশেষ আগ্রহ বোধ করে না। হুজুগ তুলে লোক লাগিয়ে, কি উপদেশ দিয়ে এদেরকে লেখাপড়ায় টানা সম্ভব নয়। সে জন্য সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের পথের কথাই বেশী করে ভাবতে হবে।

সরকারী মহলে এই ভাবনার অভাব না থাকলে অবস্থার প্রতিকারে সক্রিয় উদ্যোগ দেখা যেত। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হলে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার কিছু প্রসারের আশা তবু থাকতো। তাতো হয়নি, উপরন্তু সরকারী নীতি ও কর্মব্যবস্থা শিক্ষাকে ক্রমশঃ বেশী ব্যয়বহুল করে তুলছে। বই, কাগজ, কালি, কলমসহ শিক্ষার সকল উপকরণেরই দাম হু হু করে বেড়ে চলেছে। বাড়ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেও আনুষ্ঠানিকতার বহর। ফলে এই শ্রেণীর লোকের ছেলেমেয়েরাও পাঠশালার দোরগোড়া থেকে বিদায় নিয়ে সংসারের আয়বৃদ্ধির কাজে হাত দিচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উপেক্ষা অবহেলারও শিকার হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে। বেড়ে চলেছে শিক্ষার্থীদের সংখ্যাও। কিন্তু তাতে শিক্ষার প্রসার ঘটেনি। পাঠশালার ঘর পড় পড়, শিক্ষকের পদ খালি, চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চের অভাব সংক্রান্ত খবর পত্রপত্রিকায় অহরহ বের হয়। সরকার এ সমস্ত অভাব দূর করতেও সচেষ্ট হননি। এমন অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার লক্ষণীয় হয়ে উঠতে পারেনি।

শিক্ষা সম্পর্কে গণচেতনার সৃষ্টি কেবল নৈশ বিদ্যালয় খুলে করা যাবে না। যেখানে শিশু-কিশোররা শিক্ষার আঙ্গিনা থেকে বহু দূরে, সেখানে তাদের বাপ-দাদাদের বর্ণ-পরিচয় শিখানোয় ডেকে এনে পয়সা খরচ করার কোন অর্থ হয় না। যা করা উচিত তা হলো প্রাথমিক শিক্ষার পথ সহজ করা। যথাসম্ভব বেশী সংখ্যক ছেলেমেয়ের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হলে শিক্ষার ব্যয় কমাতেই হবে। অন্যথায় যত চিন্তা-ভাবনা করা হোক না কেন, যত বড় বড় কর্মসূচী তৈরী সরকার করুন না কেন, যে তিমিরে আমরা আছি সেই তিমিরেই আমাদেরকে থাকতে হবে।